15

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা ও এর উন্নয়ন

ডঃ আলী আসগর

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধের শিরোনাম যতটা ব্যাপক এবং যতটা প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত বহন করে, মূল প্রবন্ধ সে তুলনায় আলোচনার বিষয় নির্বাচনে অনেক সংক্ষিপ্ত হবে। এর সবটাই সময়ের অপ্রতুলতা এবং প্রবন্ধকারের অক্ষমতার জন্যে নয়। বরং এ জন্যেও যে, সেই প্রচেষ্টা প্রবন্ধকারের মতে এই মুহূর্তে অতটা আবশ্যকীয় নয় এবং সঙ্গতও নয়। বিশেষ করে ১৯৮৬তে জাতীয় ভিত্তিক পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির পেশকৃত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে। উল্লিখিত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ শামসউল হক এবং সদস্য ছিলেন উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।

বিভিন্ন অগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির পর্যালোচনা, পরীক্ষা পদ্ধতির তত্ত্বগত দিক বিবেচনা পূর্বের নানা কমিটি ও কমিশনের পরীক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ পরীক্ষা করে দেখা, পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের মতামত যাচাই এবং সবকিছুর ভিত্তিতে একটি সমন্বিত সুপারিশমালা প্রণয়ন এমন একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড–যার পটভূমিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা ও এর উন্নয়ন সম্পর্কে কথা বলা দুঃসাধ্য শুধু নয়, দুঃসাহসিকতাও। পুনরাবৃত্তির আশ্রয় না নিয়ে নতুন কিছু বলা এক্ষেত্রে যতটা দুঃসাধ্য, এত গুণীজনের দ্বারা এত বড় আয়োজনে সম্পন্ন প্রতিবেদনের বাইরে কিছু বলা ততটাই বিপজ্জনক। তাই এই প্রবন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অযাচিত কিছু ঘটে তবে তাকে ঔদ্ধত্য বিবেচনা না করে ক্ষুদ্রতরের স্বাধীনতা বলে বিবেচনা করাই সঙ্গত হবে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত একথা আমরা শুনেছি। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার জড়িত বা সম্পর্কিত হবার প্রক্রিয়াটিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত এই সম্পর্ক পারস্পরিক। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে পরীক্ষা অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর যাচাই পদ্ধতি অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এখানে উল্লেখ যে, পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির প্রতিবেদনে পরীক্ষা পদ্ধতির নানা ত্রুটি বিশ্লেষণ ও নানা পরিবর্তনের সুপারিশ থাকলেও শিক্ষার উপরে পরীক্ষা নামক প্রতিভাসটির যে সূক্ষ্ম, পরোক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে তার বিশ্লেষণ নেই।

অনেক শিক্ষাবিদ অবশ্য পরীক্ষাকে মূল শিক্ষার বহির্ভূত এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে মনে করেন। পরীক্ষা সম্পর্কে যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে সচেষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথও সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন একজামিন পাসের কুস্তির আখড়া হয়ে না ওঠে।

একথা অবশ্যই সত্য যে, শিক্ষা যেমন নিজস্ব দাবিতে প্রতিষ্ঠিত, পরীক্ষা তা নয়। শিক্ষার বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও, শুধু শিক্ষার জন্য শিক্ষা এ কথা আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু পরীক্ষা নিতে হলে এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও সার্থকতা থাকতে হবে, নতুবা শুধু ছাত্রদের নাজেহাল করার একটি অস্ত্র হিসাবে পরীক্ষা যন্ত্রটিকে পরীক্ষকদের হাতে তুলে দেবার কোন যথার্থতা থাকতে পারে না। যদিও প্লেটো তার রিপাবলিকে পরীক্ষা নেবার যৌক্তিকতা বহু আগেই ব্যক্ত করেছিলেন, "চুল্লীতে সোনা যাচাই করার চাইতে কঠিন পরীক্ষায় তাঁদের ফেলতে হবে। এসব পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে আসবে তাঁরাই শুধু সর্বসাধারণের ও নিজের মঙ্গল করতে সক্ষম হবে।"

খ্রিষ্টপূর্ব প্লেটোর যুগ থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার সঙ্গে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ না মিলবারই কথা।

শিল্প বিপ্লবের আগে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষার বিশেষ যোগসূত্র স্পষ্টভাবে কারও চোখে ধরা পড়তো না এবং কারিগরি শিক্ষায় বিপুল সংখ্যক নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলার অর্থকরী প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত ছিল বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত না হয়ে ব্যক্তি বিশেষের দানছত্রের ওপরে নির্ভরশীল ছিল। ফলে শিক্ষা একটি সামাজিক ব্যাপার না হয়ে অনেকটা সৌখিনতা হিসাবে পরিগণিত হতো।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যক্তি বিশেষের কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার মাত্র নয়। এটি আজ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান এসব জটিল বিষয়েও বিপুল সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সমগ্র জনসংখ্যা থেকে প্রতিস্তরে মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই করে তাদের যথার্থ শিক্ষায় প্রস্তুত করার গুরুভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরে অর্পিত। জাতীয় উন্নতি দ্রুততম গতিতে এগিয়ে নেবার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এক মারাত্মক পরীক্ষার সম্মুখীন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দু'টো দায়িত্ব সমান নিপুণতার সঙ্গে পালিত হওয়া প্রয়োজন–শিক্ষা প্রদান ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে তার যোগ্য কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করা। দ্বিতীয় দায়িত্বটি সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতির দ্বারাই শুধু সম্ভব। পরীক্ষা ব্যবস্থা তাই অল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধি বাছাই করার কাজে নিয়োজিত। এর লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই প্রকৃত মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাজের বিশিষ্ট কাজে নিয়োজিত করা।

প্রগতিশীল প্রতিটি সমাজ এক গতিশীলতার মধ্যে এর ভারসাম্য রক্ষা করছে। প্রতিদিন নতুন সমস্যা, নতুন প্রতিকূলতা ও বাধার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন সমাধান, নতুন আবিষ্কার ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় এই বৈচিত্র্যকে সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। বৈচিত্র্যকে বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত করে কোন এক শ্রেণী যেন অন্য এক শ্রেণীর উপরে শোষণ চালাতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সবাইকে সমান; সুযোগ প্রদান এবং মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিন্যস্ত করা। আর সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাই শুধু সমাজে সেই গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেই সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা কী তা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা সম্পর্কে কিছুটা তত্ত্বকথার অবতারণা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে যেসব লক্ষ্য পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব তা হলো : শিক্ষালাভের মান বিচার ও তার মাধ্যমে শিক্ষার মান বজায় রাখা। পরীক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের ক্ষমতা যাচাই করা। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রবণতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে মেধা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে স্তর বাছাই করা। নতুন চিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভা যাদের আছে তাদের অনুসন্ধান করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা করতে বাধ্য করার জন্য পরীক্ষাকে একটি ভীতি প্রদর্শনী অস্ত্র অথবা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টির কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা। পরীক্ষায় ছাত্রদের সাফল্যের ভিত্তিতে শিক্ষকতার মান ও সাফল্য যাচাই করা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটি কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র সংখ্যার চাপের মোকাবিলা করা। শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও সমাজের ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীর প্রভাব যাতে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি সুবিচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার বিনষ্ট করতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরীক্ষাকে একটি প্রশাসনিক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা।

উপরে উল্লিখিত কার্যকর বা ফাংশনাল যে বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার, তার

ছবি : বায়েজিদ আক্তার

প্রয়োগ দক্ষতর করার নানা চেষ্টা চলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন বলতে পরীক্ষা ব্যবস্থার এই কর্মিক দক্ষতা বৃদ্ধিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি যান্ত্রিকতা আছে। পরীক্ষা ব্যবস্থা এই যান্ত্রিক বা কৌশলগত দক্ষতা প্রশাসনিক উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত যে ত্রুটি, তার তত্ত্বগত ও দার্শনিক অসামঞ্জস্যতার বিশ্লেষণ ছাড়া মূল সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব তার সবটাই মঙ্গলকর নাও হতে পারে। এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর প্রভাব রাখতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সামাজিক বিকাশে। আর পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে নেতিবাচক ও যান্ত্রিক উপাদানগুলো কমিয়ে এনে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও কার্যকর পদ্ধতিরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষানীতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্পায়ন, যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান, সবকিছুর মূলে কাজ করতে পারে একটি সুষ্ঠু পরীক্ষা কাঠামো। পরীক্ষা সে ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের হাতে তুলে দেয়া অস্ত্র নয়। পরীক্ষার জন্যেও নিজের যোগ্যতা যাচাইয়ের একটি সুযোগরূপে কাজ করতে পারে।

আকাঙ্ক্ষিত সেই সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা যান্ত্রিকভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে। অথবা যান্ত্রিকভাবে একটি চমৎকার ব্যবস্থাপত্র উদ্ভাবিত হবার নয়, পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে। বরং সমগ্র ব্যাপারটি জৈব অভিব্যক্তি বা সজীব বিকাশের মতন হতে হবে। সামগ্রিকভাবে এই জৈবতা কিভাবে সৃষ্টি করা যায় সেই দিকে আজ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এই লেখাটিকে প্রস্তাবনা হিসাবে বিবেচনা করে আগামীতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো আমার।